একাত্তরের গল্প

একাত্তরের গল্প

আতাউর রহমান কানন

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : বাইজিদ আহমেদ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা

Ekattorer Golpa by **Ataur Rahman Kanon**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : February 2021
Price : 350.00
US $ 15
ISBN 978 984 95102 9 1

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭

http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

মা মরহুমা জামিল খাতুন
বাবা মরহুম মোহাম্মদ জাকারিয়া

লেখকের বইসমূহ :

কাব্য :
কবিতার ধ্রুবতারা
বরফ জমেছে মনে
সাংকেতিক ভালোবাসায় ডায়না
এই প্রেম এই আমি
নানা বর্ণের ফুল
ছন্দে ছন্দে মন

উপন্যাস :
কপাল
অবেলা বসন্ত
ঢেউ ভাঙা প্রেম
শেষের প্রেম
মেঘের কোলে রোদ
রিমি ফিরে এসেছে
বসন্তে ভ্যালেন্টাইন
মার্চের পর মার্চ

ভ্রমণকাহিনি :
ভ্রমণ দেশে-বিদেশে
ভ্রমণকথা
ভ্রমণবিলাস
ভ্রমণ পূর্ব-পশ্চিম

গল্প :
কিছু স্মৃতি কিছু কথা এবং আমার দেশ
শাপলা পরীর দেশে

নাট্যসমগ্র :
রোগ পাঁচালী

স্মৃতিকথা :

উত্তাল একাত্তর। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পর এ বছরের শুরুতে শান্তসৌম্য রক্তিম সূর্য পুবাকাশে উদিত হয়। আশার আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালির হৃদয় উদ্‌বেলিত হয়। দীর্ঘসংগ্রামে অর্জিত ফসল ঘরে ঘরে গোলা ভরিয়ে দেবে। সংগ্রামী প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান নানা ষড়যন্ত্রের পরও আজ মুক্ত স্বাধীন। বিপুল ভোটে নির্বাচিত নেতা আজ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক।

পৌষ-মাঘের শীত এ বছর উষ্ণতায় ভরা। শীতের কুয়াশার চাদরে দেশটা আচ্ছন্ন হলেও বাঙালিকে আর আড়ষ্ট করা যাচ্ছে না। তাদের নেতা এবার দেশের ভার নেবেন। সোনার বাংলা সোনায় পরিণত হবে। দীর্ঘ শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে রেহাই পাবে।

জানুয়ারি যায় ফেব্রুয়ারি আসে। ভাষার মাসে মায়ের ভাষার আবেগে বাঙালি আপ্লুত। সেই যে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার পর বাঙালি বাংলা ভাষাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার জন্য দাবি করে আসছিল— আজও তার ষোলো আনা দাবি রয়েছে। তাই একাত্তরের ফেব্রুয়ারি অন্যরকম ফেব্রুয়ারি। সংকলন-পত্রিকার বিশেষ প্রকাশনা বাঙালি চেতনাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আমিও বা কম কীসে? সবেমাত্র অষ্টম শ্রেণিতে উঠেছি। স্কুলের দেওয়ালপত্রিকা বের হবে ২১শে ফেরুয়ারি উপলক্ষ্যে। স্কুলের বাংলার প্রসিদ্ধ শিক্ষক ভবেশ চন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে ছাত্ররা প্রতিবছর এই দেওয়ালপত্রিকা বের করে থাকে। এর লেখক ছাত্র-শিক্ষক সকলেই। পত্রিকার সম্পাদনা পরিষদে ষষ্ঠ শ্রেণি হতে দশম শ্রেণির একজন করে মোট পাঁচজন ছাত্র স্থান পায়। তবে তারা প্রত্যেকে ক্লাসের ফার্স্ট বয়। আমি ফার্স্ট বয় হওয়াতে নিয়মের মধ্যেই স্থান পেলাম। লেখা সংগ্রহ করে রাতারাতি বলা যায় পত্রিকা লেখার কাজ শেষ করে ২১শে ফেব্রুয়ারি সকালে পত্রিকা ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। ঝোলানো মানে স্কুলের ব্ল্যাক

বোর্ড স্ট্যান্ডের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া। আমার হাতের লেখা ভালো ছিল বলে আমাকেই কষ্ট করে লেখার কাজটি করতে হয়েছিল। আজকাল দেওয়ালপত্রিকা স্কুলে বের হয় কি না আমার জানা নেই। প্রশাসনের কর্মকর্তা হিসেবে মাঠ পর্যায়ে অনেক স্কুলকলেজ ভিজিট করেছি এবং সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছি কিন্তু দেওয়ালপত্রিকা নামক কোনো বস্তু আমার চোখে পড়েছে বলে মনে পড়ে না।

এখন তো দেশ স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দীতে। একুশের চেতনা আনুষ্ঠানিকতায় ভরপুর। ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে উৎসব আর উৎসব। এ মাসেই বসন্ত শুরু— এ মাসেই আবার ভালোবাসা দিবস। পোশাক আর ফুল বিক্রেতাদের ব্যাবসার মাস। কয়েক কোটি টাকার নাকি ফুলেরই ব্যাবসা হয়। আগে আমরা তো ফুল জোগাড় করতাম অভিজাতদের বাড়ির বাগান থেকে। চাইলে না দিলে চুরি করা হতো। এখন হাতের কাছেই দোকান।

আমাদের হাইস্কুলের একাত্তরের ২১শে ফেব্রুয়ারির দেওয়ালপত্রিকায় শেখ মুজিবকে নিয়ে কবিতা-ছড়া ছিল। তাঁর বিজয়ের জয়গান ছিল। আমাদের স্কুলের গুটিকয়েক শিক্ষক এতে অসন্তোষ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হননি— পরেরদিনই ওই পত্রিকাটি সরিয়ে ফেলেন। ওই শিক্ষকদের মধ্যে একজন এককালে মুসলিম লীগের জাঁদরেল নেতাও ছিলেন। শুনেছিলাম তিনি একবার মুসলিম লীগের এমএনএ ইলেকশনে দাঁড়িয়ে ফেল করেছিলেন। পত্রিকাটি এভাবে সরিয়ে ফেলায় আমরা খুবই মন খারাপ করেছিলাম। বিশেষ করে আমার আগেরদিনের আনন্দটা পরেরদিনেই মাটি হয়ে গেল।

দিন গড়াতে থাকে দিনান্তরে। ফেব্রুয়ারি যায়। মার্চ আসে। আমাদের স্কুলের প্রাক্তন কয়েকজন ছাত্র— যারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন তারা স্কুলে এসে মাঠের এককোনায় বেঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন। দেশের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেন। ক্লাস না করে আন্দোলনে যোগদান করার আহ্বান জানান। আমরা জানতে পারি পাকিস্তানের সামরিক সরকার শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা দেবে না। নানারকম টালবাহানা করছে। ওই বড়ো ভাইয়েরা আমাদের ক্লাস বর্জনের আহ্বান করেন এবং আমাদের নিয়ে ধামরাই বাজার এলাকায় মিছিল করেন। তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা স্লোগান দিই—

‘জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো’, ‘ইয়াহিয়ার গদিতে আগুন জ্বালো একসাথে’, ‘আমার নেতা তোমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব... ইত্যাদি’।

আমাদের মিছিল আস্তে আস্তে দীর্ঘতর হয়। মিছিলে সাধারণ মানুষও যোগদান করে। মিছিল বাজার ঘুরে আবার স্কুলের মাঠে এসে জড়ো হয়। মিছিলের নেতৃত্বদানকারী ভাইয়েরা আবার বক্তৃতা করেন। আমাদের প্রতিদিন স্কুলে আসার আহ্বান জানান— তবে ক্লাস বর্জন করার নির্দেশনা দেন। ওইটুকু বয়সে রাজনীতির তেমন কিছু না বুঝলেও এটা বুঝেছিলাম যে, পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের নেতা মনে করে না। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নেতা শেখ মুজিব বিপুল ভোটে নির্বাচিত হলেও তাঁর হাতে দেশের শাসনক্ষমতা দিতে চাচ্ছে না। পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানকে শাসনের নামে শোষণ করে যাচ্ছে। একই পাকিস্তানের অধিবাসী হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে দ্বিগুণ দামে জিনিসপত্র কিনছে। বৈষম্য চরম আকারে পৌঁছেছে। এই বৈষম্য দূর করা প্রয়োজন।

৭ই মার্চ ১৯৭১। আমরা যথারীতি স্কুলে উপস্থিত। ক্লাসে রোল কল শেষ। এমন সময় আমাদের সিনিয়র ভাইদের কয়েকজন ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে জানাল আজ আমাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান জাতির উদ্দেশে রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেবেন। তোমরা সবাই তাঁর ভাষণ শুনবে। তার আগে বাজারে মিছিল বের করব।

আমাদের আর পায় কে! হুড়মুড় করে আমরা ক্লাস ছেড়ে লাফিয়ে মাঠে গিয়ে জড়ো হলাম। কিছুক্ষণ পর মিছিল শুরু হলো। ধামরাই বাজার প্রদক্ষিণ শেষে আবার স্কুলে ফিরে এলাম। স্কুলের মাঠের দুই পাশে দুইটি রেডিয়ো টেবিলের ওপর বসানো হয়েছে। ওই রেডিয়োকে কেন্দ্র করে দুই পাশে আমরা জড়ো হলাম। কয়েকজন শিক্ষকও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এর মধ্যে আমাদের ইংরেজির বয়স্ক শিক্ষক বাবু দীনেশ চন্দ্র রায় মল্লিক অন্যতম। তিনি একেবারে বলা যায় রেডিয়ো আগলে বসেছেন। তাঁর হাতে সব সময় একটি বেত থাকে। আজ তিনি খালি হাতে। দীনেশ বাবু হাতে বেত রাখতেন ছাত্রদের শাসন করার জন্য কিন্তু কখনো কাউকে বেত মারতে দেখিনি। এ

প্রসঙ্গে আরেকজন শিক্ষক সম্পর্কে না বলে পারছি না। তিনি মজিদ মাস্টার। তাঁর হাতেও সব সময় বেত থাকত। বেতটি বেশ মোটা ও শক্ত ছিল। ওই বেতের বাড়ি খায়নি এমন ছাত্র খুঁজে পাওয়া ভার। তিনি প্রতিদিন স্কুলে এসে ওই বেত হাতে নিতেন। এরপর মাঠে পিটি ক্লাসে গিয়ে দাঁড়াতেন। ক্লাসওয়ারি আমরা লাইন ধরে পিটি ক্লাসে দাঁড়াতাম। শারীরিক কসরত শেষে জাতীয় সংগীত গাওয়া হতো। এরপর ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে শুরু করে লাইন ধরে ক্লাসে ঢুকতাম আর ক্লাসে ঢোকার সময় মজিদ মাস্টার ছাত্রদের স্কুল ড্রেস লক্ষ করতেন। ড্রেস ঠিক না থাকলেও বাড়ি, থাকলেও বাড়ি দিয়ে ক্লাসে ঢোকাতেন। সবাইকে বাড়ি দেওয়ার রহস্য আমি আজও উদ্‌ঘাটন করতে পারিনি। এই মজিদ মাস্টারের প্রেসক্রিপশনেই ধামরাই হার্ডিঞ্জ হাইস্কুলের স্কুল ড্রেস নির্ধারিত ছিল। ড্রেসটি ছিল অদ্ভুত ধরনের। সাদা পায়জামা, সাদা শার্ট এবং তিন ভাঁজওয়ালা সাদা টুপি। শার্টের ডিজাইনটাই ছিল বেশি অদ্ভুত। শার্টে কলার, পাঞ্জাবির মতো দুই পাশে ঝোলানো দুইটা পকেট এবং বুকের বামপাশে একটা পকেট। এলাকায় ওই শার্ট ব্যাপারী শার্ট হিসেবে বেশ পরিচিত ছিল। আর তিন ভাঁজওয়ালা ওই টুপিটি মজিদ ক্যাপ হিসেবে অভিহিত ছিল। দরজিদের মজিদ ক্যাপ বললেই হুবহু বানিয়ে দিত। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রায় ওই ধরনের টুপি পরতেন। স্কুলের মুসলমান ছাত্রদের জন্য ওই টুপি পরা ছিল বাধ্যতামূলক। তবে আমাদের স্কুলের পইতা-টিকিধারী পণ্ডিত মশাইও ওই টুপি পরতেন। কেন পরতেন সেটা রহস্যাবৃত। তিনি কি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর অনুসারী ছিলেন, নাকি মজিদ মাস্টারের ভয়ে পরতেন তা জানতাম না। তবে ওই পণ্ডিত মশাইকে দেখলে ছাত্রদের অন্তরাত্মা এমনিতেই শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত। আমরা ভুলেও তাঁর ধারেকাছে যেতাম না। তার মুখে কেউ কোনোদিন হাসির লেশমাত্র দেখেনি— তবে হাতে সর্বদা মোটা বেতের লাঠি দেখেছে। শুনেছিলাম তাঁর স্ত্রী নাকি কোনো এক রাতে পালিয়ে গেছে— তার আর হদিস মেলেনি।

সময় আর কাটে না। আমরা অধীর আগ্রহে রেডিয়োর সামনে বসা। বিভিন্ন প্রোগ্রাম একটার পর একটা চলতে থাকে। শেখ মুজিবের ভাষণ আর শুরু হয় না। কিন্তু কেউ নড়ছিও না। এই বুঝি শুরু হয়

হয়...।

আমার স্মৃতিতে শেখ মুজিব ভেসে ওঠেন। তাঁর কণ্ঠ যেন আজও আমি কান খাড়া করলেই শুনতে পাই। মনে হয় এই তো গেল সত্তরের অক্টোবরের শেষে তাঁর বিশাল জনসভায় গিয়ে তাঁর বজ্রকণ্ঠের ভাষণ শুনেছি। তিনি সেদিন আমাদের ধামরাইয়ের কালামপুর ভালুম আতাউর রহমান খান হাইস্কুলের ময়দানে নির্বাচনি ভাষণ দিয়েছেন। আমি ওই বয়সে অন্যান্যদের সাথে ৫ কিলোমিটার পথ হেঁটে সেই জনসভায় উপস্থিত হই। সভাস্থল যেন মানুষের সমুদ্র। মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে নিবিষ্টচিত্তে তাঁর ভাষণ শুনল। তিনি ভোট চাইলেন নৌকায়; মানুষ দুই হাত তুলে সমর্থন দিলো।

সভাটি ভাঙল সন্ধ্যা হয় হয় সময়ে। মানুষ বাড়ির পথে যেতে যেতে 'শেখ মুজিব এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে', 'ভোট দেবো কীসে নৌকায় নৌকায়' স্লোগান দিতে থাকে। খণ্ড খণ্ড মিছিল। আমরা কয়েকজন সহপাঠী একসাথে ছিলাম। রাজনীতির 'র'ও বুঝি না কিন্তু ওই স্লোগান আমরাও দিতে দিতে বাড়িতে ফিরে আসি।

সেদিন বাড়িতে ফিরতে বেশ রাত হলো। সাধারণত সন্ধের পর বাড়িতে ফিরলে আমাকে কৈফিয়ত দিতে হতো। আজ আর বাড়ির কারো কাছে জবাবদিহি করতে হলো না। বাবা অসুস্থ হয়ে ছয় মাস ধরে বিছানায় শয্যাশায়ী। আমি বাড়ি ফেরার পর তিনি জনসভার বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন— শেখ সাহেবের সভায় লোক কেমন হয়েছিল রে?

আমি বললাম, অনেক লোক বাবা। স্কুলের মাঠ ভরতি হয়ে রাস্তায় রাস্তায় লোক।

—তুই শেখ মুজিবকে দেখতে পাইছিস?

—হ্যাঁ, পাইছি। রাস্তার যেখানে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম উনি গাড়ি থেকে নেমে ঠিক সেখান দিয়েই হেঁটে গিয়ে মঞ্চে উঠেছেন।

—দেখতে কেমন?

—লম্বাচওড়া, পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা। আর পাঞ্জাবির ওপর হাতাছাড়া কালো কোট ছিল।

আমার খুব দেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কী করব! আমি তো হাঁটতে পারি না বাবা। যাক কপালে নাই কী আর করা। একটু থেমে বাবা

আবার বললেন, বেচারা মুজিব সারাজীবন শুধু জেলের ঘানিই টানলেন। পাকিস্তানিদের নির্যাতনে নির্যাতনে কাহিল হলেও একটুও দমেননি। তবে দেখিস এবারের ভোটে বিপুল জয় পাবেন।

—হ্যাঁ বাবা জিতে যাবেনই। সব মানুষ দুই হাত তুলে নৌকায় ভোট দেওয়ার জন্য সমর্থন দিয়েছে।

—তা তো দিবেই। এ দেশের মানুষ পাকিস্তানিদের অত্যাচার-নির্যাতন আর শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি চায়।

বাবা আবার কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, সামনে তোর বার্ষিক পরীক্ষা। তাড়াতাড়ি খেয়ে পড়তে বসগে।

এ তো আমার কদিন আগেরই স্মৃতি। শেখ মুজিবের বলিষ্ঠ চেহারাখানি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। বেলা গড়িয়ে প্রায় তিনটা। দীর্ঘ প্রতীক্ষায় আছি তাঁর ভাষণ শোনার জন্য। রেডিয়োর সামনে বসেও মনে হচ্ছে তাঁর সামনে যেন বসে আছি। রেডিয়োতে এখন 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'— গানটি বাজছে। সবার কান খাড়া। এই বুঝি এখনই ভাষণ শুরু হচ্ছে— সুনসান নীরবতা। গান শেষ হলো। রেডিয়োর শব্দও বন্ধ হলো। হয়তো ভাষণ রিলের প্রস্তুতি চলছে। আমার আগ্রহ আরও বাড়ল। মাঠে ঘাসের ওপর বসেছিলাম। একটু নড়েচড়ে কান খাড়া করলাম। সবাই চুপচাপ, এই বুঝি শুরু হয়— এই বুঝি শুরু হয়। সময় গড়াতে থাকে, ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে। শুরু তো আর হচ্ছে না। রেডিয়োতে শুধু কেমন যেন বজবজ শব্দ হতে থাকল। রেডিয়োর কাছে বসা সিনিয়র ভাইদের মধ্যে একজন রেডিয়ো পরীক্ষা করলেন। না, সবই তো ঠিক আছে— শুধু রেডিয়ো পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র বন্ধ। এভাবে সময় গড়িয়ে যায় রেডিয়ো আর গলা খোলে না। আমরা শ্রোতারা কিন্তু রেডিয়ো আগলে বসেই আছি। কেউ নড়ছি না। যদি ভাষণ শুরু হয়ে যায়! এভাবে সন্ধ্যা হয় হয় অবস্থা। তখন সিনিয়র ভাইয়েরা জানালেন, নিশ্চয়ই হারামজাদা সরকার শেখ মুজিবের ভাষণ রেডিয়োতে রিলে করতে দেয়নি। শ্রোতারা ভাষণ শুনতে না পাওয়ার বেদনা নিয়ে আস্তে আস্তে উঠতে থাকে। তবে যাওয়ার সময় স্লোগান দিতে থাকে— 'শেখ মুজিবের কিছু হলে, জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে'; 'মুজিব তুমি এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে'; 'রেডিয়ো প্রচার বন্ধ কেন, ইয়াহিয়া জবাব চাই'...।

খণ্ড খণ্ড মিছিল। এক সময় জোড়া লেগে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলো। স্কুল এলাকা ছাড়িয়ে মিছিল বাজার এলাকায় প্রবেশ করল।

বাজারের দোকানদার কর্মচারী ক্রেতা সাধারণ— সবাই একে একে মিছিলে যোগ দিতে থাকে। ‘জয় বাংলা’ স্লোগানে স্লোগানে বাজার এলাকা মুখরিত হয়ে উঠে। শেখ মুজিবের ভাষণ প্রচার না-করার বিষয়টি দেশের জনগণকে আরও ক্ষিপ্ত করে তুলল। মানুষের আকাঙ্ক্ষায় যেন কুঠারাঘাত করা হয়েছে। মানুষ শেখ মুজিবের নৌকায় ভোট দিয়েছে। তারা শেখ মুজিবকে নেতা মেনেছে। তাঁকে তারা ক্ষমতায় আসীন দেখতে চায়। কোনো টালবাহানা তারা মেনে নিতে রাজি না। মিছিল এগিয়ে চলে। মানুষের প্রতিবাদী-সংগ্রামী-কণ্ঠস্বরের উচ্চতাও বাড়তে থাকে। এই মিছিল তো ন্যায্য মিছিল, এ মিছিল তো আলোর মিছিল। এ মিছিল থামায় এমন সাধ্যি কার?

এক সময় মিছিল ধামরাই বাজারের প্রসিদ্ধ রথখোলায় গিয়ে থামল। রথের ওপর কয়েকজন সিনিয়র ভাই দাঁড়ালেন এবং তাদের একজন সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন। তার বক্তব্যের মূলকথা হলো— কুচক্রী সরকার আজ শেখ মুজিবের ভাষণ রেডিয়োতে প্রচার হতে দেয় নাই। রেডিয়ো বন্ধ করে দিয়েছে। আগামীকাল সকাল দশটায় এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হবে। আপনারা সবাই দলে দলে যোগদান করবেন। আজকের মিছিল এখানেই শেষ। সবাইকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা।

সেদিন মিছিলশেষে সন্ধের কিছু আগে আগে বাড়ি ফেরার সময় নদীর ঘাটে খেয়ানৌকার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল বেশ অনেকক্ষণ। মিছিলের লোকজন দলে দলে বাড়ি ফিরছিল। আমাদের বাড়ি ধামরাই বাজার হতে প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্বে। বাজার এবং আমাদের গ্রামের মধ্য দিয়ে বংশী নদী প্রবাহিত। নদীটি মোটামুটি প্রশস্ত এবং স্রোতঃস্বিনী। এ নদীতে আগে বারোমাসই লঞ্চ-স্টিমার চলত। এখন শীতকালের কয়েকমাস চলে না। তবে ছোটোখাটো নৌযান চলাচল করে। এ নদীটি এ এলাকার প্রাণ বলা যায়। আমরা এই নদীতে ঝাঁপাঝাঁপি ডুবোডুবি করে বড়ো হয়েছি।

খেয়ানৌকা ঘাটে ভিড়তেই হুড়োহুড়ি করে নৌকায় গিয়ে উঠলাম। খেয়ামাঝি গুল মিয়া নৌকা ছাড়ল। নৌকার মধ্যে মিছিলে অংশ নেওয়া লোকজনই বেশি। শেখ মুজিবের আজকের ভাষণ প্রচার না হওয়া নিয়ে নানারকম আলোচনা-সমালোচনা চলছে। কেউ বলছেন— এইবার

ইয়াহিয়া-ভুট্টোরা শেখ মুজিবকে ভয় পেয়েছে। কেউ আবার বললেন, শেখ মুজিব বাপের ব্যাটা একটা। কাউকে পরোয়া করে কথা বলে না। ইয়াহিয়া ক্ষমতা নিয়া আর কতদিন টালবাহানা করবে? ক্ষমতা তাকে ছাড়তেই হবে। মাঝি গুল মিয়া বলে উঠল— ‘জয় বাংলা, মুজিব তুমি এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে’।

নৌকার যাত্রীদের মধ্যেও বেশ একটা সংগ্রামী সংগ্রামী ভাব এসে গেছে। খেয়ানৌকা ঘাটে ভিড়তেই আমরা অল্পবয়সিরা ‘জয় বাংলা’ বলে লাফিয়ে নামতে থাকলাম। নৌকা আন্দোলিত হতে থাকে। জলে ঢেউ ওঠে। এ ঢেউই যেন আজ সারাদেশের বাঙালির হৃদয়ের ঢেউ।

বাড়িতে ফিরে আমাদের বাড়ির নিয়মানুযায়ী সন্ধ্যার পরপরই খেতে বসলাম। মা ভাত বেড়ে দিচ্ছেন। আমরা ভাইবোনেরা খেতে বসেছি। মা একফাঁকে আমাকে শাসনের সুরে বললেন, সারাদিন কোথায় টোটো করে ঘুরছিস? পড়ালেখা সব লাটে তুলেছিস?

আমি বললাম, মা আমরা তো এখন দেশের জন্য মিছিল-সংগ্রাম করছি। স্কুলে কোনো ক্লাস হয় না। আজ শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় ভাষণ দিয়েছেন।

মা বললেন, তা ভাষণে শেখ সাহেব কী বললেন?

—ভাষণ শুনতে পাই নাই। রেডিয়োতে প্রচার করার কথা ছিল। প্রচার হয় নাই।

—কেন?

—জানি না। তবে রেডিয়ো একেবারেই বন্ধ।

—পাকিস্তানিরা যে হারামি! ওরা সহজে গদি দেবে না। আর ওরা মানুষ মারতে ওস্তাদ। দেশের মানুষ তো কম মারল না।

মা একটু থেমে আমার পাতে এক চামচ ভাত তুলে দিয়ে বললেন, শেখ মুজিবের ভাষণ শুনে যদি দেশের মানুষ খেপে ওঠে তখন ওদের জন্যই বিপদ। তাই চালাকি করে প্রচারই বন্ধ করে দিয়েছে।

এমন সময় আমার সেজো ভাই ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। কলেজের হোস্টেলে থাকেন। তাকে দেখেই মা তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেসা করলেন, কিরে, তুই চলে এসেছিস! তোর শরীর ভালো? দেশের যা অবস্থা! বাড়িতে এসে ভালোই করছিস বাবা।

স্কুলকলেজে নাকি গন্ডগোল বেশি— ইত্যাদি নানা কথায় তাকে জর্জরিত করলেন।

আমার খাওয়া শেষ। আমি উঠে গেলাম। সেজো ভাই মায়ের কথার কিছু জবাব দিলেন, কিছু চাপা পড়ল। তিনি ফ্রেশ হয়ে খেতে বসলেন। রক্ষে বাবা নেই। তিনি থাকলে আরও প্রশ্ন করতেন। বাবা অসুস্থ অবস্থায় দীর্ঘ নয় মাস বিছানায় ছিলেন। প্রায় দুই মাস আগে মাত্র চুয়ান্ন বছরে তিনি ইহলোক ছেড়েছেন। আমাদের শোক ধীরে ধীরে কমে এলেও মা এখনো শোকাচ্ছন্ন। আটজন ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। প্রায়ই সরবে-নীরবে কান্নাকাটি করেন। তার বড়ো দুই ছেলে রোজগার করেন। তারা বিবাহিত। বাকি ছেলেমেয়ে সবাই লেখাপড়া করে। কীভাবে এদের মানুষ করবেন— সে চিন্তাতেই তিনি বেশি চিন্তিত। আমরা বাইরে থাকলে তার দুশ্চিন্তার আর শেষ থাকে না। আর আমার প্রতি তার একটু বাড়াবাড়ি রকমের পক্ষপাতিত্ব ছিল। এটা কীজন্য আমি ওই বয়সে বুঝতে অক্ষম ছিলাম। পরে বড়ো হয়ে যতটুকু জেনেছি তা হলো— আমি ছোটোবেলা থেকেই তার ন্যাওটা। আর প্রতি ক্লাসে পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়ার কারণে তার ধারণা ছিল আমি ভবিষ্যতে একটা কিছু হবো।

মায়ের এ ধারণাকে দোষ দিয়ে আর কী হবে। বাবাও বেঁচে থাকতে আমাকে নিয়ে বেশ গর্ব অনুভব করতেন। তাঁর বন্ধুদের কাছে কিংবা নিকট-আত্মীয়দের কাছে আমার প্রসঙ্গ উঠতেই বলতেন— আমার ছোটো ছেলেটার মাথা ভালো। ও অনেক বড়ো হবে।

পরবর্তীতে আমি বড়ো হয়েছি— তবে অনেক বড়ো কি না জানি না। আমি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে যোগ দিয়ে যে পর্যন্ত উঠেছি সেখানে এ দেশের কয়জনই বা উঠতে পারেন? আমার বাবা-মা বেঁচে থাকলে হয়তো খুশি হতেন নিঃসন্দেহে।

রেডিয়ো পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রিত খবরের ওপর জনগণের আস্থা অনেক আগেই উঠে গেছে। মানুষ আকাশবাণী কলকাতা ও বিবিসির বাংলা সংবাদের ওপরই ভরসা করতে থাকে। রেডিয়ো সেটও তখন সকলের ঘরে ছিল না। মানুষ রেডিয়ো শোনার জন্য ভিড় করত হোটেল রেস্তোরাঁ আর চায়ের দোকানে দোকানে। পাড়া-মহল্লায় যেসব সচ্ছল ব্যক্তির রেডিয়ো ছিল সে বাড়িতেও ভিড় হতো। ঢাকা শহরের কিছু সচ্ছল ব্যক্তির বাসায় তখন টেলিভিশন ছিল। তবে রেডিয়ো বলি আর

টেলিভিশনই বলি সব প্রচারমাধ্যমই তখন সামরিক সরকারকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। আমাদের একটি থ্রি ব্যান্ডের ফিলিপস রেডিয়ো ছিল। আমি নিয়মিত সকাল সন্ধ্যার সংবাদ শুনতাম। নাটক ও অনুরোধের আসরও আমার প্রিয় ছিল। আমাদের প্রতিবেশীরাও আমাদের বাড়িতে মাঝেমধ্যে আসতেন। সংগ্রামের দিনগুলোতে তারা খবর শুনতে বেশি আগ্রহ নিয়ে আসতেন। মানুষের ভেতর তখন অন্যরকম একটা উত্তেজনা কাজ করছিল।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে আমি রেডিয়ো খুললাম। ঢাকা কেন্দ্রে কোনো শব্দ নেই। কিছুক্ষণ পরপর কেন্দ্রের নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চেক করলাম। কাজ হলো না। সেজো ভাইও আমার কাছ থেকে রেডিয়ো নিয়ে চেক করে ব্যর্থ হলেন। শেখ মুজিবের ভাষণ আর শোনা হলো না। নিরাশ হয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরেরদিন সকাল আটটার দিকে রেডিয়োর নব ঘোরালাম। রেডিয়ো তখন জবান খুলেছে। বেশ স্বস্তি পেলাম। কিছুক্ষণ পর ঘোষণা শুনলাম সকাল সাড়ে আটটায় শেখ মুজিবের ধারণকৃত ভাষণ প্রচার করা হবে। নিজের কানকে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারলাম না। যে ভাষণ শোনার জন্য কাল থেকে ছটফট করছি— সেই ভাষণ প্রচার করা হবে? দ্বিতীয়বার ঘোষণাটি শোনার পর বিশ্বাস হলো। তখন আমাকে আর পায় কে? আমি রেডিয়োর কাছে জেঁকে বসে রইলাম। সাড়ে আটটা বাজে না কেন বাজে না কেন বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি। মনটা বেশ অস্থির হয়ে উঠল। আর হবেই বা না কেন? গতকাল সারা বিকাল-সন্ধ্যা অধীর অপেক্ষা করেও নিরাশ হয়েছি। আজ আবার কী হয় কে জানে! গতকালও তো ভাষণ প্রচারের ঘোষণা ছিল— শেষ পর্যন্ত হলো না। আজকেও যদি গতকালের মতো শেষ মুহূর্তে...। নিজের মনের ভেতরই বেজে উঠল, না না আজ আর তেমন হবে না। হওয়া উচিতও না। ওরা কি এতই অমানুষ? বাঙালির বাড়া ভাতে বারবার ছাই দেবে? পরক্ষণেই মনে উদয় হলো— আজ না জানি কী মতলব এঁটেছে। ওই পশ্চিম পাকিস্তানি জানোয়ারদের একদম বিশ্বাস নেই।

আমার মন নানা কিছু ভাবতে থাকল। আমার সেজো ভাই শয্যাত্যাগ করে হাতের তালুর উলটো পিঠে চোখ মুছতে মুছতে

রেডিয়োর কাছে এসে বসলেন। একফাঁকে রেডিয়োটা টেনে নিজের কাছে নিলেন। আমি তাকে বাধা দিতে গিয়েও থেমে গেলাম ধমক খাওয়ার ভয়ে। বরঞ্চ আমিই একটু এগিয়ে রেডিয়োর কাছে গেলাম। সাড়ে আটটা বাজল। ঘোষণা হলো— এখন শেখ মুজিবুর রহমানের গতকালের ধারণকৃত ভাষণ প্রচার করা হচ্ছে। আমার কান দুখানা সঙ্গে সঙ্গে খাড়া হয়ে গেল।

এমন সময় কানে ভেসে এলো শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠ 'ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি...।'

আমার গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে উঠল। একান্ত মনোযোগ রেডিয়োর দিকে। কোনো ফাঁকে যেন দেশের নেতার কোনো কথা শোনা বাদ না পড়ে। এমন ভরাট-দরাজ কণ্ঠস্বর! মোহাবিষ্ট হয়ে প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য শ্রবণ করতে থাকলাম। তিনি অনর্গল বলে যেতে থাকলেন। আমার ভেতরটা নেচে উঠতে থাকে। তিনি শেষ করলেন— 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।' তাঁর ভাষণ শেষ হওয়ার পর মনে হলো এত দ্রুত শেষ হয়ে গেল! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় হিসাব করে দেখলাম প্রায় পনেরো মিনিট প্রচার হয়েছে। এমন ভাষণ সারাদিনই শোনা যায় মনে হতে লাগল।

তাঁর ভাষণে দেশের সকল সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালত-প্রতিষ্ঠান শিল্পকারখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার আহ্বান রয়েছে। আমরা ছাত্ররা তো গেল কদিন স্কুলে শুধু যাওয়ার জন্য যাচ্ছিলাম কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই তো মিছিল হরতালে অংশ নিচ্ছি। এখন তো আর ক্লাস হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তবে আজকের পূর্বঘোষিত মিছিলে তো যোগদান করতেই হবে।

আমি স্কুল পোশাক পরে রেডি হলাম। আমার সেজো ভাইও রেডি হলেন। আমরা দুই ভাই চললাম মিছিলে যোগ দিতে। মিছিল শুরুর স্থান ধামরাই হার্ডিঞ্জ হাইস্কুল মাঠ। সেখানে গিয়ে দেখি অনেক লোক জড়ো হয়েছে। শেখ মুজিবের ভাষণ নিয়ে বলাবলি হচ্ছে। বুঝলাম, অনেকেই আজ রেডিয়োতে ভাষণ শুনেছেন। সবার মধ্যেই সংগ্রামী ভাব ও উত্তেজনা বিরাজমান। মিছিল শুরু হতে হতে এগারোটা বেজে

গেল।

আগে মিছিলে স্কুলের কোনো শিক্ষক অংশ নেননি। আজ দেখা গেল বেশ কয়েকজন শিক্ষকও আমাদের মিছিলের অগ্রভাগে রয়েছেন। বাবু দীনেশচন্দ্র রায় মল্লিক তাদের মধ্যে অন্যতম। মিছিল ধামরাই বাজারের বিভিন্ন পথ ও গলি ঘুরে রথখোলা এলাকায় গিয়ে আজও শেষ হলো। আজ গতকালের চেয়েও অনেক বেশি লোক হয়েছে। দোকানপাট প্রায় বন্ধ বলা যায়। মাথার ওপর ফাল্গুনের শেষের রোদ। কিছু জনতার সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। তারা স্লোগানে স্লোগানে এলাকা প্রকম্পিত করে তুলেছে। জনতা যেভাবে জেগেছে এবার আর পাকিস্তানিদের বিদায় না নিয়ে উপায় নেই।

মিছিলশেষে আমাদের বাড়ি ফেরার পালা। আমরা চার সহপাঠী আহাম্মদ আলী, আবদুর রউফ, আবদুস সবুর ও আমি একত্র হলাম। এদিক-সেদিক কিছুক্ষণ ঘুরেফিরে আমাদের আরেক বন্ধু রফিকদের বাগানবাড়িতে ঢুকলাম। রফিককে আজ মিছিলে খুঁজে পাওয়া গেল না। হয়তো বাড়ি থেকে বের হয়নি। বাগানে বরই পেকে লোভনীয় রূপ ধারণ করেছে। আমগাছে সবে মুকুল এসেছে। তবে বেলগাছে বেল ঝুলছে। বাগানে কোনো পাহারাদার নেই। আমাদের আর পায় কে? রউফ আর সবুর গাছে চড়ায় ওস্তাদ। হড়হড় করে রউফ বরইগাছে আর সবুর বেলগাছে উঠে গেল। রউফ বরইগাছে চড়ে জোরে কয়েকটি ঝাঁকি দেওয়াতে পাকা এবং অর্ধপাকা বরই ঝরঝরিয়ে নিচে পড়ে গেল। আমরা বরই কুড়িয়ে জমা করলাম। ওদিকে সবুর ঝাঁকিয়ে কয়েকটি বেল নিচে ফেলে দিলো।

আমি সবুরকে বললাম, বেল ছিঁড়ে নামিয়ে আন। ফেটে যাবে যে। সবুর বলল, আরে বোকা, পাকা বেল ঝাঁকিয়ে ফেলতে হয়। তুই গাছের নিচ থেকে দূরে যা— নইলে আবার তোর বেল ফাইটা যাইব।

আমি এমনিতেই গাছ থেকে একটু দূরেই ছিলাম তবুও সবুরের কথায় আরও সরে গেলাম। বলা তো যায় না কখন ছুটে এসে মাথায় পড়ে!

গেছো বন্ধু দুজন নেমে এলো গাছ থেকে। আমরা জনপ্রতি ভাগে একটি করে বেল এবং এক সের পরিমাণ বরই পেলাম। অনুমতি ছাড়া যখন এসব ফল পেড়েছি— তাই তাড়াতাড়ি ফল নিয়ে সটকে পড়াই

ভালো। একহাতে বেল নিলাম। আরেকহাত খালি। কিন্তু বরইয়ের পরিমাণ যা তা হাতে বা পায়জামার পকেটে নেওয়া যাবে না। কী আর করা— আমাদের মধ্যে সবচেয়ে দুষ্টু সবুর মাথা থেকে মজিদ ক্যাপ নামিয়ে তার ভাঁজ খুলে সেখানে তার ভাগের বরই তুলতে থাকে এবং আমাদেরও বলে তাকে অনুসরণ করতে। আমি কিছুটা ইতস্তত করছিলাম। কিন্তু অন্য বন্ধুরা যখন একই কাজ করছে তখন আমিও তাই করলাম। ওই ক্যাপের ভেতর বরই নেওয়ার পরও দেখি অনেক জায়গা তখন বেলটাকে রেখে মুখ চেপে ধরলাম। আমার দেখাদেখি এবার অন্যরাও তাই করল।

নদীর পাড়ের মেঠো পথ ধরে আমরা খেয়াঘাটে গিয়ে পৌঁছালাম। তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। খেয়াঘাটে তেমন ভিড় নেই। আমরা যখন খেয়ানৌকার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম তখন দেখি রফিক কোথা থেকে যেন সেখানে হাজির। আমি তো বেশ লজ্জা পেলাম। মুখের রক্ত যেন উধাও হয়ে গেল। আমরা তেমন করে কেউ তার সাথে কথা বলতে পারলাম না।

সবুর রফিককে একরকম চার্জ করে বলল, ওই শালা, তুই কই ছিলি? স্কুল তো ফাঁকি দিচ্ছিস— মিছিলেও তো দেখলাম না!

রফিক আমাদের মজিদ ক্যাপের অসম্মানজনক অপব্যবহারের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তোরা টুপিকে বাজারের পুঁটলি বানিয়েছিস? কী ওতে দেখি! সে সবুরের পুঁটলির দিকে হাত বাড়ায়। সবুর তার পুঁটলি সরিয়ে নিয়ে বলে তোর দেখে কাজ নাই। শেষে মন খারাপ করবি।

রফিক বলল, মন খারাপের কী আছে? তোরা তো আমার দোস্ত!

রফিক দেখি দেখি করে শেষে পুঁটলি খুলে দেখেই ফেলল। এরপর জেরা চলল— কোথায় পেলি, কে দিয়েছে, সবই তো একইরকম পুঁটলি... ইত্যাদি।

সবুর ও তো রাখঢাক বোঝে না। বলল, তোকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে শেষে তোর জরিমানাস্বরূপ তোদের মালোপাড়ার বাগানে ঢুকে কাম সারলাম। তুই থাকলে তোরও একটা পুঁটলি হতো।

রফিক একগাল হেসে বলল, শালা ছিঁচকে চোরের দল। আমাকে নিয়ে গেলে তো ডাকাতি করা হইত।

রফিক পুঁটলি থেকে কয়েকটি বরই নিয়ে নিজের পায়জামায় ঘষা দিয়ে মুখে পুরে কচকচিয়ে খেতে লাগল।

রফিকের মুখখানি দেখে আমার পাণ্ডুর মুখখানা আবার স্বাভাবিক হলো। আমার পুঁটলি থেকে এক মুষ্টি বরই আমি রফিকের জামার সাইড পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম। নিজেকে তখন সাধু সাধু মনে হতে লাগল। রফিক আমাদের এলাকার সবচেয়ে অন্যতম ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান। ওদের জায়গাজমি বাড়িগাড়ির অভাব নেই। তিন ভাইয়ের মধ্যে সে ছোটো। তার মনটা বেশ উদার এবং সহজসরল। স্কুলে আমাদের এক ক্লাস ওপরের শ্রেণিতে পড়লেও প্রায় সারাক্ষণ আমরা একইসাথে থাকি, বেড়াই, খেলা করি।